কোনও মাস্টার প্ল্যান নেই বলেই জলবন্দি

বৃহত্তর স্বার্থে হাওড়া ও কাটাখালের বাঁধ দখল বন্ধ করা সমীচিন, সমাজের লাখ লাখ লোকের কথা চিন্তা করে সরকারের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেওয়ার মানসিকতা তৈরি করা। কেন্দ্রীয় সরকার গঙ্গা দূষণ প্রকল্প নিয়ে কোটি কোটি টাকা খরচ করছেন। আর যদি আমাদের মাননীয় সাংসদগণ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মাননীয়া উমা ভারতীর নজরে আমাদের দুর্দশার করুণ চিত্র তুলে ধরতেন তা হলেও মানুষ কিছুটা শান্তি পেত। —বিমান চন্দ্র সাহা

প্রতি বছর বর্ষা আসে আবার বর্ষা চলেও যায়। বর্ষায় জলবন্দি অবস্থায় ঘরে বসে থাকতে হয়। আগরতলা শহরের নিম্নাঞ্চলের অবস্থা করুণ হয়ে থাকে। আগরতলা শহরের জলবন্দি অবস্থা নিয়ে মাননীয় সুভাষ চন্দ্র সাহা, মাননীয় মিহির দেব মহাশয়, সিনিয়র সিটিজেন ফোরাম এবং আরও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গিতে লিখেছেন। এই সমস্ত লেখার মূল কারণ হল আগরতলা শহরের জল নিষ্কাশন পরিকল্পনা কি হওয়া উচিত তার পথ দেখানো। সরকারের কি করণীয় তা সবিস্তারে লিখেছেন। সরকারের তাতে টনক নড়েছে কিনা তা বিশ্লেষণ সাপেক্ষ। এতসব লিখার আগে বলতে হয় আগরতলা শহর বলতে কি বুঝায়। অনেকে আগরতলা শহর বলতে শহরের মধ্যাঞ্চল বুঝাতে চেয়েছেন। কিন্তু আগরতলা কর্পোরেশন হওয়ার পর এখন বলতে হয় হাওড়া নদীর দক্ষিণাংশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল, কাশীপুরের বিস্তীর্ণ অঞ্চল এবং কাটাখালের উত্তরাংশ নিয়ে আগরতলা শহর। তাই উপরিউক্ত অঞ্চল নিয়ে দেখাটা যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়, তাই এখন ভাবতে হবে আগরতলা শহরের মধ্যাঞ্চল, চন্দ্রপুর বাঁধের বৃহদাংশ, কাটাখালের উত্তরাংশ নিয়ে। অনেকে হয়ত বা চিন্তা করে থাকেন কাটাখালের উত্তরাংশ মূলত: উঁচু টিলা, কথাটা সত্যি। তবু বলতে হয় ওই সমস্ত অঞ্চলে কিছু কিছু নিম্নাঞ্চল জলে ডুবে থাকে। এই বারের বর্ষায় দেখা যায় অভয়নগরের বিস্তীর্ণ অংশ এবং ইন্দ্রনগরের বেশ কিছু বাড়ি জলের নীচে ছিল। হাওড়া নদীর দক্ষিণাংশে প্রায় সব জায়গায় বুক সমান জল ছিল। চন্দ্রপুর থেকে খয়েরপুর অবধি মূলতঃ জলমগ্ন ছিল। এ সমস্ত লেখার অর্থ সরকারকে সমালোচনা করা নয় বরঞ্চ সরকারের পক্ষে যা করণীয় তা তুলে ধরা।

পূর্ত দপ্তরের প্ল্যানিং সেকশনে বহু বছর কর্মরত থাকার অভিজ্ঞতা নিয়ে বলতে হয়, যে কোন সমস্যার সমাধানের জন্য তিনটি স্তর বিদ্যমান- (১) তাৎক্ষণিক পরিকল্পনা (২) স্বল্প মেয়াদি পরিকল্পনা (৩) দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা। যাকে আমরা মাস্টার প্ল্যান বলে থাকি। তখন কেন্দ্রীয় সরকারের পরামর্শ ও নির্দেশে কুড়ি বছরের পরিকল্পনা হত। অর্থের জোগানের উপর নির্ভর করে অগ্রাধিকার তালিকা বানানো হত। সেই অনুসারে পরিকল্পনা রূপায়ণ হতে, সেই ধারা সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানীয় জল সরবরাহের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ছিল। গতানুগতিক শিডিউল বানানো হয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের পরামর্শ নিয়ে। সেই অনুসারে অগ্রাধিকার ঠিক করা হলেও বাস্তবে সেই ভাবে পরিকল্পনা রূপায়িত হতো বলে মনে হয় না। ইঞ্জিনীয়ারগণও নিজেদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে কর্তার ইচ্ছায় কীর্তন গাইতেন। অতীত কথা বলে, ইতিহাস বর্তমানকে পরিচালিত করে। তার আগে বলতে হয় তাৎক্ষণিক পরিকল্পনা কি! তাৎক্ষণিক পরিকল্পনা হল দুর্যোগের সময়ে প্রয়োজন ভিত্তিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া। যেমন আগরতলার কভার্ড ড্রেনে কোথাও আবর্জনার ফলে জল নিষ্কাশনের অসুবিধা হল কি না, কোথাও পলির স্তর অস্বাভাবিক কি না, পাম্পগুলি ঠিক মতো চলছে কি না, বিদ্যুৎ ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ কিনা! কোথাও নদীর বাঁধ ভাঙনের অবস্থায় এসে গেছে কি না! ইঞ্জিনীয়ারদেরকে সে সব ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে কি না! তবে এটুকু বলা যায় সে সব ক্ষমতা ইঞ্জিনীয়ারদের দেওয়া আছে এবং থাকবে। স্বল্প মেয়াদি পরিকল্পনায় ধরা যাক্ কভার্ড ড্রেন নিয়ে স্বল্প মেয়াদি পরিকল্পনা কি হওয়া উচিত। ম্যানহোল কাভার পর্যাপ্ত কি না। কিছু দিন পর পর পলি ও আবর্জনা সরিয়ে ফেলা। পাম্পগুলি কিছু দিন পর মহড়া দিয়ে দেখা কোন রকম যান্ত্রিক ত্রুটি রয়েছে কি না। একথা বলার অর্থ বছরের নভেম্বর মাস থেকে মূলতঃ এপ্রিল মাস পর্যন্ত পাম্পগুলি অকেজো থাকে, তাতে পাম্প সেটগুলি প্রয়োজনের সময় চালানো যায় না। আমার নিজস্ব গাড়ি ছিল, বছরের ছয় মাস আমেরিকা বা লণ্ডন থেকে এসে দেখতাম গাড়ি আর চলছে না। গাড়ির চাকা জ্যাম হয়ে গেছে। তারপর কুড়ি থেকে পঁচিশ হাজার টাকা খরচ করলে গাড়ি চলাচলের উপযুক্ত হতো। ঠিক একই অবস্থা পাম্প সেটটি অকেজো হওয়ার মূল কারণ। কেউ কেউ লিখেছেন এখন তো দিল্লী, মুম্বাই, কলকাতা শহরে বর্ষায় জল দাঁড়িয়ে থাকে কথাটা সত্যি হলেও জলে আগরতলা শহরের মতো বারো ঘণ্টা থেকে চব্বিশ ঘণ্টা অবধি মানুষ জলবন্দি থাকে না। সাধারণত ঃ তিন থেকে চার ঘণ্টার মধ্যে জল নিষ্কাশন হয়। তাই ওই সমস্ত

উদাহরণ আগরতলার ক্ষেত্রে মানান সই বলে মনে হয় না। পত্রিকার মাধ্যমে অনেকে বলেছেন কভার্ড ড্রেনের উচ্চতা রাস্তা থেকে এক ফুট বা দুই ফুট উচ্চ। তাই রাস্তার জল কিভাবে কভার্ড ড্রেনে যাবে তা নিয়ে অনেকের প্রশ্ন। তাই বলছি এ সমস্ত ছোট খাটো ব্যাপার যারা কাজের দায়িত্বে আছেন তাদের দেখার মধ্যে পরে। আরও বলছি পাম্পগুলির আয়ু সীমাবদ্ধ। পাম্পিং সিস্টেম কখন থেকে চালু হল। তার উৎস বা কি?

খুব সম্ভব ১৯৭৮ সালে তদানীন্তন স্বর্গীয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী মহাশয় পূর্ত দপ্তরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, আগরতলার জল নিষ্কাশনের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা কি হওয়া উচিত তা নিয়ে মাস্টার প্ল্যান তৈরি করতে। খুব সম্ভবতর তখন চাষ নালা, কয়লা খনিতে জল ঢুকায় কর্মরত শ্রমিকরা মরণাপন্ন। তখন ইঞ্জিনীয়ারগণ বড় বড় পাম্প বসিয়ে উদ্ধার কার্য সম্পন্ন করেন। তখন সেই চিন্তা ভাবনা থেকে ত্রিপুরা রাজ্যের ইঞ্জিনীয়ারগণ পাম্পিং প্ল্যান প্রয়োজনীয়তার কথা ভাবতে লাগলেন। কোথাও কোথাও পাম্প সেট বসান হয়েছে। মাস্টার প্ল্যান তৈরি করার প্রয়োজনীয়তার কথা ভাবতে হয়েছে। কতগুলি প্রয়োজন ভিত্তিক ব্যবস্থা নেওয়া আসু কর্তব্য। এখন দেখা যায় একটু বৃষ্টি হলে আখাউড়া খাল ও কালাপানিয়া খাল জলে ভর্তি থাকে। তাহলে শহর জলে ভাসবেই। কারণ শহরের জল আখাউড়া খাল ও কালাপানিয়া খাল দিয়া নিষ্কাশিত হয়। এখন দেখা যাক কালাপানিয়া খালে প্যারাডাইস চৌমুহনিতে জল কিভাবে কম আসবে। বর্তমানে গান্ধীইল রোডের রামকৃষ্ণ মিশনের পিছনের দিকে পাম্প সেট বসানো হয়েছে। সেই পাম্প আদৌ চলছে কিনা সন্দেহ আছে। যদি পাম্প চলেও থাকে তাহলে প্রয়োজন অনুসারে পাম্পিং হয় না। এখন ধরা যাক সেন্ট্রাল রোড এক্সটেনশনে যদি পাম্প বসিয়ে হাওড়া নদীতে জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা হয় তাহলে দেখা যাবে প্যারাডাইস চৌমুহনিতে জল থাকার কথা না। তবু যদি প্রয়োজন হয় তা হলে বীরেন্দ্র ক্লাবের সামনে পাম্প বসিয়ে জয়নগরের দুর্দশা কিছুটা লাঘব করা যায়। সবচেয়ে দুঃখ দায়ক বিষয় হল পূর্ব থানার কাছে পাম্প অকেজো কারও হেলদোল নেই। এখন আসা যাক গোলবাজারের গোলচক্কর থেকে চিত্তরঞ্জন রোড পর্যন্ত একটু বর্ষা হলে প্রচুর জল হয়। তা থেকে উত্তরণের কি উপায়। আগেও অনেক বার লেখা হয়েছে আবারও লেখা হল। মাননীয় স্বর্গীয় মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী ১৯৮০ সালে যখন ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন বাংলার মসনদে ছিলেন মাননীয় স্বর্গীয় মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবসু। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর অনুরোধে কলকাতা নিগমের কিছু স্বনামধন্য ইঞ্জিনীয়ারদের কে এনে পরামর্শ নেন। সেই পরামর্শ সবারই জানা দরকার। কাউকে জ্ঞান দেওয়ার জন্য তা লেখা নয়। তা হলে সে পরামর্শ কি ছিল, আগরতলার মধ্যাঞ্চলকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছিল।

চিন্তা ধারা ছিল যেন কোন অবস্থাতে আখাউড়া খালে চাপ না হয়। তাই শিবনগর ও কলেজটিলায় জল কোন অবস্থায় যেন শিবনগর ও বনমালীপুরকে জলমগ্ন না থাকে। তাই মঠ চৌমুহনির কলেজ মোড় থেকে পূর্বাশা হয়ে পুরাতন জেলখানা হয়ে খাল নির্মাণ করে কাটাখালে জল ফেলার বন্দোবস্ত করা হয়। পরামর্শ ছিল কলেজ রোডের কালভার্ট বন্ধ করে দেওয়া। কিন্তু বাস্তবে তা বন্ধ করা হয় নি। কেন এবং কি কারণে বন্ধ হল না তা বলা মুস্কিল, হয়ত বা রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা হতে পারে। তা হলে ইঞ্জিনীয়ারদের ঘাড়ে দোষ চাপানো উচিত হবেনা, সঙ্গে সঙ্গে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল যদি শিবনগরের জল জমে যায় তা জয়গুরু ফার্মেসি থেকে পাম্পিং করে কাটাখালে ফেলতে হবে, তার পরে উনাদের পরামর্শ ছিল শিবনগর ও জগহরিমুড়ার জল কোন অবস্থায় যেন আখাউড়া খালে না আসতে পারে। তাই অন্ততঃ চিত্তরঞ্জন রোডের খালের উপর অন্ততঃ দুইটা পাম্পিং স্টেশন করে চিত্তরঞ্জন রোডের খালের জল হাওড়া নদীতে ফেলার পরিকল্পনা নিতে হবে, চিত্তরঞ্জন রোডের পাম্পিং স্টেশন চিত্তরঞ্জন রোডের মুখে এবং আরেকটি মাঝামাঝি জায়গায় বসাতে হবে। এখন ভাবুন এ সমস্ত পরিকল্পনা যদি বাস্তবায়িত হত তা হলে এক কথায় বলতে গেলে আখাউড়া খালের উপর চাপ পড়ত না। যে কোন প্রকল্পের কাজ ওপরতলা থেকে বাস্তবায়ন করে নিচুতলার কথা চিন্তা করলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নিচের দিকের খালের গভীরতা ও প্রস্থ নিয়মানুসারে নিলে বোধই হয় ভালো হত। তা না করে প্রথম কভার্ড ড্রেন নির্মাণ করা হল উমাকান্ত স্কুলের উল্টো দিক থেকে। এ বিষয়ে আর কিছু বিষদ ভাবে না বলা শ্রেয়। আর একটা বড় সিদ্ধান্ত সরকারকে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয় যে উত্তর বনমালীপুরের জল আখাউড়া খালকে চাপ মুক্ত করার একমাত্র পথ। এখন আনন্দের সঙ্গে বলতে হয় শোনা যায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দেরিতে হলেও বুঝতে পেরেছেন উত্তর বনমালীপুরের জল যেন কোন অবস্থায় আখাউড়া খালে আসতে না দেওয়া হয়। অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি আখাউড়া খালে যদি জল কম থাকে তা হলে রবীন্দ্রভবন চত্বর, মধ্যপাড়া, ওরিয়েন্ট চৌমুহনী, কর্ণেল চৌমুহনী, বিদুরকর্তা চৌমুহনী জলের হাত থেকে রেহাই পেতে বাধ্য রাজ্য সরকার সীমিত ক্ষমতার মধ্যে কিছু কিছু পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন কিংবা নেবেন। তা ধন্যবাদের যোগ্য। এখন আসা যাক দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প বলতে কী বোঝায়। দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প হলো সে সমস্ত প্রকল্প সময়সাপেক্ষ, ব্যয় সাপেক্ষ এবং আন্তর্জাতিক বাধ্য বাধকতা। তাই কেন্দ্রীয় সরকার অর্থাৎ বর্তমান বিজেপি সরকার চুপ করে বাসে থাকবেন তা সমীচিন নয়। স্পষ্ট করে বলতে গেলে হাওড়া নদী ও কাটাখালের নাব্যতা বাড়ানোর উপায় খুঁজে বের করা। বাংলাদেশের তিতাস নদীতে যেহেতু হাওড়া ও কাটাখাল মিশে গেছে তাহলে নাব্যতা বাড়াতে গেলে বাংলাদেশের মতামত জরুরি প্রয়োজন। তাছাড়া অনেকে লিখেছেন হাওড়া নদীর শুরুর দিকে এ ছোট মিনি ব্যারেজ করলে শুধু বর্ষার জল নয় হাওড়ার নদীতে বছরের সব সময় জল থাকবে। তবে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যাতে হাওড়ার উজানে উপজাতি ভাইরা বাস করেন তাদের যেন কোন রকম ক্ষতি না হয়। হাওড়া বাঁধ প্রকল্পের রিপোর্ট সেচ দপ্তরে পাওয়া যাবে। মিনি ব্যারেজ করার ফলে দেখা যাবে হাওড়া নদীর তীর চম্পকনগর থেকে আগরতলা অবধি ভাঙনের হাত থেকে রক্ষা পাবে। নদীর দুই তীরকে কনফান্ড ব্যাঙ্ক করার প্রয়োজনীয়তা সবাই আশা করেন, নদীর তীরে যে সমস্ত বসতি বা ঘরবাড়ি আছে দেশের বৃহত্তর স্বার্থে হাওড়া ও কাটাখালের বাঁধ দখল বন্ধ করা সমীচিন, সমাজের লাখ লাখ লোকের কথা চিন্তা করে সরকারের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেওয়ার মানসিকতা তৈরি করা। কেন্দ্রীয় সরকার গঙ্গা দূষণ প্রকল্প নিয়ে কোটি কোটি টাকা খরচ করছেন। আর যদি আমাদের মাননীয় সাংসদ গণ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মাননীয়া উমা ভারতীর নজরে আমাদের দুর্দশার করুণ চিত্র তুলে ধরতেন তা হলেও মানুষ কিছুটা শান্তি পেত।

আর ত্রিপুরার বিজেপির বর্তমান কর্ণধারগণ নিজেদের দায়বদ্ধতার কথা চিন্তা করেন কি না সন্দেহ মানুষের মনে জাগে। অনেকে আবার লিখেছেন ঘোড়ামারার ছড়ার জল যদি হাওড়া নদীতে নিয়ে আসা হতো তাহলেও রাণীরবাজার অঞ্চলের মানুষের কিছুটা সুরাহা হতো। কিন্তু কথা হলো যেখানে হাওড়া নদীর নাব্যতা দিনকে দিন কমছে সেখানে হাওড়া নদীকে চাপ বাড়ানো কেন। তাই আবারও লিখি হাওড়া নদী ও কাটাখালের নাব্যতা বাড়ানোর অর্থ হাওড়া নদীর দক্ষিণ অংশের মানুষকে এবং খয়েরপুর, রাণীরবাজার, জিরানীয়া অঞ্চলের জনসাধারণকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ করে দেওয়া। দৈনিক বাজারে গেলে দেখা যায় শাক-সবজির দাম নাগালের বাইরে। গরিব লোকদের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে। শাক-সবজি প্রায় নষ্ট হয়ে গেছে। জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা তলানিতে চলে গেছে। ইঞ্জিনীয়ারিং ছাত্র হিসাবে পলিটিকেল সায়েন্স এবং অর্থনীতি পড়তে হয়। কারণ যে কোন প্রকল্পের ভায়াবিলিটি এই সমস্ত দিক বিবেচনা করে করতে হয়। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে এখন দেখা যাচ্ছে কোন মাস্টার প্ল্যান নেই। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রশাসনিক কর্তাদের সমস্যার কথা বললে কিছু তথ্যদেওয়া, এই শেষ কথা। এটা কিন্তু করুণ দৃশ্য।

তাই পরিশেষে বলছি কেন্দ্র ও রাজ্য সবাই এগিয়ে আসুন এবং আগরতলা স্মার্ট সিটিকে সত্যিকারের অর্থে স্মার্ট সিটি তৈরি করুন।